Vol. 52 | No. 2 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আহসান হাবীবের কবিতা : সময়-সমাজ-রাজনীতি

Volume	52
Issue	2
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	তারেক রেজা
Published online	February 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v52i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i2.5
Pages	৬৭-৮৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

আহসান হাবীবের কবিতা : সময়-সমাজ-রাজনীতি

Check for updates

তারেক রেজা*

শিল্পসাহিত্যে ব্যক্তিপ্রতিভার চেতনা ও সংবেদ স্বকালের পটভূমিতে সংহত হয়েই কালোত্তীর্ণ সৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃত ও সমাদৃত হয়ে থাকে। মহৎ সৃষ্টির আবেদন দেশকাল-নিরপেক্ষ হলেও তাতে অনিবার্যভাবেই স্রষ্টার সমকালীন সমাজজীবনের ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। তীব্র স্বকালমগ্নতা থেকেই একজন প্রতিভাবান ব্যক্তিচৈতন্যের কাল-অতিক্রমী অভিজ্ঞান অর্জিত হয়। সৃষ্টির আনন্দে উদ্বেলিত ব্যক্তিমাত্রই সংবেদনশীল এবং স্বকালসচেতন। এমনকি রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গেও তিনি নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকেন। তিনি কেবল সময় ও সমাজের প্রকৃতি কিংবা পরিবর্তনের একজন দ্রষ্টা নন, বিদ্যমান এবং বদলে যাওয়া বিশ্বব্যবস্থার হৃৎস্পন্দনের একজন নিবিড় পাঠকও তিনি। এই পাঠাভ্যাস থেকে সঞ্চিত সম্পদেই নির্মিত হয় তাঁর শিল্পসৌধ।

একজন ব্যক্তিত্বচিহ্নিত শিল্পস্রষ্টা সময় ও সমাজের সীমানা অতিক্রম করে তাঁর শিল্পকর্মকে সর্বকালের ও সর্বমানবের অনুভব ও অভিজ্ঞতার সামগ্রী করে তোলেন, কিন্তু তাঁর শেকড় প্রোথিত থাকে স্বকালের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পটপরিবর্তন কিংবা বাঁক-বদলের গভীর প্রদেশে। একইসঙ্গে ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্বভাব-স্বরূপ বিষয়েও তাঁকে সচেতন থাকতে হয়। জীবনানন্দ দাশ কবিতার অন্তর ও অবয়বকে ইতিহাস ও সময়চেতনার সমান্তরালে স্থাপন করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থি-র ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান। কাল বা সময় বৈনাশিক; কিন্তু সে সেই কুয়াশাগুলোকেই কেটে-কেটে চলেছে যা পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপ্তি বাড়াবার পক্ষে অন্তরায়ের মতো।' (জীবনানন্দ, ২০০২ : ২৯)। আবার কবিতার আলোচনায় জীবন ও কবিতার সম্বন্ধের গভীরতা বিষয়ে তিনি বলেছেন, 'কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুইরকম উৎসারণ'। (২০০২ : ১৭)। কবিতার কাছে আমাদের প্রত্যাশা ব্যাপক-বিচিত্র-বিপুলতর হলেও জীবনের অনুরণনই কালোত্তীর্ণ সৃষ্টির প্রধানতম অবলম্বন। একজন স্রষ্টার জীবনকে, বিশেষত তাঁর অন্তর্ভুবনকে বিচিত্র পন্থায় প্রভাবিত করে তাঁর সমকালীন জীবন, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল। একজন কবি সমাজের অভ্যন্তর থেকেই সৃষ্টির রসদ সংগ্রহ করে অন্তরের উষ্ণতায় তাকে শিল্প করে তোলেন। রফিকউল্লাহ খান যথার্থই বলেছেন, 'ব্যক্তির যে আত্ম-উন্মোচন কবিতার উদ্দেশ্য, তা ব্যক্তির আত্ম-সামাজিকীকরণেরই নামান্তর। কবিতা এই আত্ম-উন্মোচনের শিল্পসম্মত একটি প্রক্রিয়া।' (১৯৮৯ : ৯)। সর্বকালের সৃজনশীল ব্যক্তিত্বই বিশ্বনাগরিক এবং আধুনিক। কিন্তু এই বৈশ্বিক চিন্তা ও আধুনিক-মানসতার বোধ সময়-সমাজ-স্বদেশের বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের অন্তরঙ্গ অবলোকনেই তাঁর চৈতন্যে জন্ম লাভ করে। সময় ও সমাজের সঙ্গে 'এই সংযোগ কবি তাঁর চেতন ও অবচেতন মানসে অনুভব করেন এবং যেহেতু তিনি বিশ্বেরই নাগরিক, ফলে তাঁর রচনায় বিশ্বমানব-

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

চৈতন্যের নির্বাধ রূপায়ণ ঘটে। সমকালীন বিশ্ব ও সমাজ-অভিঘাতস্পৃষ্ট ব্যক্তিজীবনের অস্তিত্বসংকট কবির রচনায় রূপায়িত হয়।' (মাহবুব, ১৯৯১ : ১৮৮)। সময়ের সকল অভিঘাতকেই তিনি স্বাগত জানান না কিংবা সমাজ-রাষ্ট্রের সকল আলোড়নের কাছেই তিনি প্রণত হন না; কিন্তু সেইসব অভিঘাত-আন্দোলনকে স্পর্শ করেই তিনি পরিণত ও পরিস্ফুট হন। তাই যে-কোনো সফল শিল্পস্রষ্টার সৃজনবিশ্বে পরিভ্রমণের সময় আমরা তাঁর 'কালের যাত্রার ধ্বনি' শুনতে পাই।

সৃজনশীল মানুষ যে-কোনো সময়ের সাধারণ জনতার চেয়ে অধিকতর সংবেদনশীল বলেই তাঁর কালের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহে তিনি সবচেয়ে বেশি সক্রিয়তা প্রদর্শন করেন। তাঁর সৃষ্টিকর্ম সেই সক্রিয়তারই উজ্জ্বল নিদর্শন। সাহিত্যস্রষ্টার চেতনার সদাজাগ্রত মাঠে কালপ্রবাহে যে ফসল ফলে, তাতে সময়ের চিহ্ন সর্বদাই যে সপ্রকাশ্য এমন নয়, কিন্তু ফসলের বুকের গভীরে তার অনুরণন অনিবার্য এবং অলঙ্ঘনীয়। প্রতিভাবান এবং যুগোত্তীর্ণ শিল্পস্রষ্টারাও তাঁদের সৃষ্টিকর্মে দেশকাল ও যুগধর্মের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তাঁদের সৃজনবিশ্বেও তার স্বাক্ষর স্পষ্ট। তাঁদের কেউ-কেউ এ বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অভিমতও ব্যক্ত করেছেন। সাহিত্যের অন্তর ও অবয়ব নির্মাণে স্রষ্টার দেশকাল ও যুগধর্ম কীভাবে অবদান রাখে, স্বকালের স্বভাব ও প্রভাব কীভাবে লেখকের মানসচৈতন্যের অনুমোদন পেয়ে কালোত্তীর্ণ শিল্পে সংগুপ্ত থাকে, সে-বিষয়ে কয়েকজন সমালোচক ও শিল্পস্রষ্টার মন্তব্য নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

ক. যে কালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে হয়তো আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেছে। তাকে উদ্দেশ্য নাম দিতে পারি বা না পারি, একথা বলা চলে যে, লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করছে। ... আমি বলছি এ কাজও শিল্পকাজ, শিক্ষাদানের কাজ নয়। কাল আমাদের মনের মধ্যে তার নানা রঙের সুতোয় জাল বুনছে, সেই তার সৃষ্টি, আমি তার থেকে কিছু যদি আদায় করতে চাই তবে সে উদ্দেশ্য আমারই। ... কবির কাব্যের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে আর তার দেশকালের সঙ্গে একটা প্রাণগত সম্মিলন আছে। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ৪/৭৯২)

খ. বর্তমানই লেখকের উপজীব্য; ভবিষ্যতে যদি কোন আলো তিনি ফেলতে পারেন, সে-আলো বর্তমান প্রসঙ্গে প্রতিহত হ'য়েই; নিজের কালকে তিনি যদি ভালোরকম বুঝে থাকেন তা'হলেই তাঁর লেখায় হয়তো ভবিষ্যতের কোনো ইঙ্গিত ধরা পড়বে। শেষ বিচারে মানতেই হবে যে লেখকের ধর্মই সমকালীনতা। (বুদ্ধদেব, ১৯৫৯ : ৮)

গ. সাহিত্য যেন একটি ফুলের গাছ। কোন এক বিশেষ বাগানের মাটি থেকে উদ্ভূত হয়ে গাছটি তার ফুলের সৌরভ বিস্তারিত করে দেয় সীমাহীন আকাশের দিকে। কিন্তু প্রাণরস সে আহরণ করে তার সেই বাগানের মাটি থেকেই। সাহিত্যের সৌরভও তেমনি সার্বজনীন, চিরকালীন এবং সীমাহীন; কিন্তু তারও প্রাণরস আসবে এক বিশেষ দেশ ও কালের মাটি থেকেই। এই 'মাটির' সঙ্গে যোগ না থাকলে সাহিত্য প্রাণহীন হতে বাধ্য। (মোফাজ্জল, ১৯৬৭ : ২৫)

ঘ. সাহিত্য সমাজেরই প্রতিচ্ছায়া। সাহিত্যের দর্পণে সমাজ প্রতিবিম্বিত হয়। সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজের মানুষজন, তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমৃদ্ধি-বিপর্যয়, আর্থিক অবস্থা, ধর্ম-বিশ্বাস, নৈতিক মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক আদর্শ ইত্যাদির সঙ্গে আমাদের পরিচিতি ঘটে। সমাজের আনন্দোৎসবের মধ্যে স্মিতহাস্যে দাঁড়িয়ে সাহিত্যিকের লেখনী

> যেমন আত্মপ্রকাশের অধীরতায় চঞ্চল হয়ে ওঠে, তেমনি বিপর্যয়ের কটু-তিক্ত স্বাদও মসীরেখার মধ্যেই তাঁকে মুক্তির সন্ধান দেয়। (বিনতা, ১৯৯৭ : ১)
>
> ঙ. A poet is nothing if not sensitive to his environment : when he feels all round him the blood begining to circulate again and the heart beating more strongly, it will be strange if this does not communicate itself to his verse. (Lewis, 1947 : 26)

শিল্পসাহিত্যে স্রষ্টার স্বকাল যে অমোচনীয় চিহ্ন রেখে যায় সে-বিষয়ে সমালোচকবৃন্দের বিবেচনায় বিশেষ কোনো ব্যবধান বা অনৈক্য চোখে পড়ে না। সাহিত্যে সময়কে ধারণ করার মানসতা সর্বদাই যে সচেতন প্রয়াসে সিদ্ধ তা নিশ্চয়ই বলা যাবে না। শিল্পীর অসচেতন বা অসতর্ক মুহূর্তেও স্বকালের ছায়াপাত অনিবার্য। সমালোচকবৃন্দের উপরিউক্ত বিবেচনা ও মন্তব্যের আলোকে আমরা আহসান হাবীবের (১৯১৭-১৯৮৫) কবিতায় বিম্বিত সময়-সমাজ-রাজনীতির স্বরূপ অনুধাবনের প্রয়াস পাব। স্বকালের বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহ কবির জীবনবোধ ও শিল্পদৃষ্টিকে কীভাবে সমৃদ্ধ কিংবা শানিত করেছে, বর্তমান নিবন্ধে সে-বিষয়েও দৃষ্টিপাতের চেষ্টা থাকবে।

কবিতায় সময় ও সমাজের উপস্থিতি-বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন আহসান হাবীব, যার স্বাক্ষর তাঁর কবিতা এবং কবিতা-সম্পর্কিত নানা আলোচনায় লক্ষ করা যায়। 'সাধারণভাবে সমাজান্তর্গত মানুষই তাঁর কবিতার মুখ্য বিষয়। তাঁদের দুঃখ-বেদনা ও স্বপ্ন-সম্ভাবনাকে তিনি অবলম্বন করেছেন কবিতা-রচনায়, অথচ লক্ষ্যযোগ্য, একই দৃষ্টিতে ও একই ভঙ্গিতে তিনি সর্বদা বিষয়ের পরিচর্যা করেননি।' (সাঈদ, ২০০১ : ২১৫)। সমাজের মানুষকে তিনি কবিতায় ধারণ করেছেন বলেই তাতে সমাজের বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহেরও ছায়াপাত ঘটেছে। আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন, 'আহসান হাবীবের কবিতায় সমাজ ও ব্যক্তি একটি রেখায় এসে মিশেছে।' (মান্নান, ১৯৮৮ : ১৯)। মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেছেন 'আমাদের সমাজে সমাজচেতনাসম্পন্ন কবির সংখ্যা কম। যে-ক'জন আছেন তাদের মধ্যে ... আহসান হাবীব নাম করবার মতো।' (মোতাহের, ১৯৯৫ : ৪৭৪)। আহসান হাবীব সমাজকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন নি বলেই বোধকরি মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, 'আহসান হাবীবের সমাজচেতনা মোটের উপর শিল্পগত ব্যাপার', কিন্তু সমাজচেতনাকে শিল্পরূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে আহসান হাবীবের কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন তিনি। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা-বিষয়েও সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তাঁর সৃজনকর্মে উপস্থিত। নিজের কবিতা নিয়ে কথা বলতে স্বস্তি বোধ করতেন না আহসান হাবীব। এমনকি তাঁর জীবদ্দশায় তিনি বা তাঁর কবিতা নিয়ে বিশেষ কোনো আয়োজন বা আড়ম্বরে অস্বস্তিবোধ করতেন তিনি। এ প্রসঙ্গে আনওয়ার আহমদ লিখেছেন, 'আমার প্রস্তাব ছিল — হাবীব ভাইকে নিয়ে আমি কবিতাপত্র, কিছুধ্বনির একটা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে চাই। কিন্তু তিনি রাজি হননি। তাঁর একটাই কথা...আমার জীবদ্দশায় নয়, আমি যেদিন থাকব না, সেদিন যা খুশী কর, আমার বলার কিছু থাকবে না।' (আনওয়ার, ১৯৮৭ : ২৯৮)। প্রচারবিমুখ আহসান হাবীব নিজের কবিতা নিয়ে খুব কম কথাই বলেছেন। এ বিষয়ে *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*-এর ভূমিকায় বর্ণিত মন্তব্যই গদ্যে লিখিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন বলে আমরা মনে করি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাত্রিশেষ* (১৯৪৭)-এর বিষয়বস্তু

হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন 'বণ্টনবৈষম্য, সামাজিক অসাম্য, পরাধীনতা, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মহাযুদ্ধের দায়' ইত্যাদি প্রসঙ্গ, এবং 'উত্তরতিরিশ কবিতার সমাজ সচেতন অধ্যায়ে নিজের সংলগ্নতা' এভাবেই আবিষ্কার করেছেন তিনি। আহসান হাবীবের কবিতায় স্বকালের প্রভাব সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেছেন :

> দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিলগ্ন, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনার তীব্রতা তিনি অনুভব করেছেন কাব্যচর্চার সূচনা পর্বে। অতঃপর যে সকল সামাজিক রাজনৈতিক পট পরিবর্তন তাঁর কাব্য প্রবাহের সময়কালে ঘটেছে তা হচ্ছে বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ কিংবা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রভৃতি। (বিশ্বজিৎ, ১৩৯৮ : ৫৩)

প্রথম কাব্যগ্রন্থের যে বৈষয়িক পরিমণ্ডল, তা থেকে আহসান হাবীব কখনোই পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হন নি। সময় ও সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কের প্রকাশপ্রবণতায় যদিও লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু যে কালখণ্ড ও সমাজকাঠামোয় নির্মিত হয়েছে তাঁর মানসভূগোল, সেই সময় এবং সমাজজীবনের অন্তর্গত অনুরণনকে কবিতায় ধারণ-প্রক্রিয়ায় তাঁর চেষ্টা ও নিষ্ঠা প্রশ্নাতীত। এ-প্রসঙ্গে হুমায়ুন আজাদ (১৯৯৬ : ২৫) লিখেছেন, '...এ কাব্যেই [*রাত্রিশেষ*] সর্বপ্রথম একজন মুসলমান কবি ব্যাপক বিংশ শতকী চেতনাসহ আত্মপ্রকাশ করেন।' সময়ের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেন আহসান হাবীব। প্রবহমাণ সময়ের চরিত্র ও চলনে যে নতুনত্ব এসেছে, তার সঙ্গে তাঁর কাব্যের বিষয় ও প্রকরণকলায় পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন তিনি। নিচের উদ্ধৃতি থেকে তাঁর সময়চেতনা ও সমাজসংলগ্নতার স্বরূপ অনুধাবন করা যাবে :

> আমাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে, সময়ের এই ঔদ্ধত্যের কাছে আমি হার মানতে চাই না কখনো। আর সময় এগোতে এগোতে ভাষা থেকে কিছু কিছু ক্ষয়ে যাওয়া শব্দ ফেলে রেখে যায়, সামনে থেকে তুলে নেয় কিছু উজ্জ্বল নতুন শব্দ। ভাষা প্রকরণ থেকে কিছু পুরনো ভঙ্গি মুছে যেতে থাকে, গড়ে ওঠে কিছু তীক্ষ্ণতর নতুন ভঙ্গি। সময়ের সঙ্গে থেকে থেকে কবি যদি সময়ের শেষ সীমায় অবগাহন করেন পাঠককেও থাকতে হবে তার কাছাকাছি। (আহসান, ১৯৯৫ : ৩৫০)

প্রবল স্বকালমগ্নতা কবি ও কবিতার পক্ষে কতটা স্বাস্থ্যকর সে-বিষয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু আহসান হাবীব প্রথম থেকেই 'সময়ের সঙ্গে থেকে' নিজের কণ্ঠস্বর নির্মাণ করতে চেয়েছেন। *রাত্রিশেষ*-এর বিশেষত্ব চিহ্নিত করতে গিয়ে একজন সমালোচক লিখেছেন, 'আহসান হাবীব প্রথম কাব্যগ্রন্থেই নৈরাশ্য-অতিক্রমী আশার সুর শুনিয়েছেন। এই সদর্থক চেতনাই আহসান হাবীবের মধ্যে আত্ম-অতিক্রমণের বীজশক্তি হিসেবে কাজ করেছে।' (রফিকউল্লাহ, ২০০২ : ১৩-১৪)। হাবীবের কবিতায় প্রতিভাসিত নৈরাশ্যের উৎস অনুসন্ধানে অবতীর্ণ হলে আমরা লক্ষ করব, স্বকালের অস্থির ও অসুস্থ সমাজ-প্রতিবেশই তাঁর সৃজনবিশ্বে প্রণোদনা সঞ্চার করেছে। *রাত্রিশেষ*-এর পর্যায় বিভাজনের মধ্যেই তাঁর কালসচেতন শিল্পচৈতন্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থভুক্ত কবিতাসমূহের রচনাকাল ১৯৩৮-১৯৪৬ এবং এই কালখণ্ডের চরিত্র বিষয়ে তাঁর মন্তব্য : 'বাংলা কবিতা যখন সমাজসম্পৃক্ত এক নতুন সংজ্ঞায় নতুন দিগন্তে উত্তীর্ণ হচ্ছে', তার স্বাক্ষর এই কাব্যে উপস্থিত। এই

কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে 'প্রহর', 'প্রান্তিক', 'প্রতিভাস', 'পদক্ষেপ'– এই নামকরণের যৌক্তিকতা বিষয়ে কবির বক্তব্য :

> যে আবেগ থেকে এর 'প্রহর' পর্যায় উৎসারিত তাকে অতিক্রম করে, ইতিহাসের অগ্রগমন অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাসবিমুখ শ্রান্তি থেকে তাই 'প্রান্তিক' পর্যায়ের দ্বিধান্বিত স্বাক্ষর। কিন্তু সমাজ মানসে ইতিহাস-চেতনার ব্যাপ্তি ব্যক্তিমানসে নতুন ইতিহাস যোজনায় অক্ষম নয়। আর ঐতিহাসিক অভিঘাত শিল্পী-জীবনের অভিজ্ঞতায়ও নতুন আলোকসম্পাতে সক্ষম। এই বিশ্বাস আর এই অনুভবই 'প্রতিভাস' পর্যায়ের ক্রান্তিকালে 'পদক্ষেপ'-এর সূচনা করেছে শিল্পীমানসে। (আহসান, ১৯৯৫ : ৩)

সময় ও সমাজের সঙ্গে কবির এই সম্পৃক্ততার স্বাক্ষর তাঁর কবিতায় স্পষ্ট হলেও তা কাব্যের শৈল্পিক অবয়বকে আচ্ছন্ন কিংবা প্রতিহত করতে পারে নি। 'কবিতাকে রাজনৈতিক বক্তৃতা করে তোলার পক্ষপাতী' তিনি নন 'বরং কবিতা হোক রাজনৈতিক মঞ্চের বিশুদ্ধ প্রেরণা' — এই বিশ্বাসে অটল ছিলেন তিনি। 'দিনগুলি মোর' কবিতায় যখন 'যুগের চিতায় জ্বলে জীবনের প্রিয় প্রভাত', তখন তাঁর চোখ আলোকিত দিনের কামনায় ঊর্ধ্বে তাকিয়ে থেকেছে এবং তাঁর চৈতন্যের অশ্ব পথ চলতে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। দুঃসহ দিনের যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছেন তিনি, তবু শর-খাওয়া হরিণ শিশুর আর্তনাদের মধ্যে মুক্তির প্রচ্ছন্ন প্রত্যাশাও জাগিয়ে রেখেছেন :

> দিনগুলি আজ জরতী রাতের দুঃস্বপন,
> চির দহনের তিক্ত শপথ করে বহন!
> দিনগুলি মোর শ্বাপদ-বিজয়ী অরণ্যেতে
> শর-খাওয়া এক হরিণ-শিশুর আর্তনাদ। ('দিনগুলি মোর'/*রাত্রিশেষ*)

স্বকালের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়োজনেই আহসান হাবীব প্রচল শব্দ-শরীরে ভিন্নতর দ্যোতনা সঞ্চারের চেষ্টা করেন। উপরিউক্ত কবিতাংশের ভাষিক প্রবণতা চিহ্নিত করতে গিয়ে বেগম আকতার কামাল লিখেছেন, "এখানে সময় ও বিরুদ্ধ প্রতিবেশের চিরাচরিত রূপকল্প হিসেবে প্রযুক্ত হয় 'দহন', 'শপথ', 'অরণ্য', 'শর', 'হরিণ-শিশু' ইত্যাদি প্রচলিত শব্দপ্রতিমা; কবিতাংশের নতুনত্ব হল 'জরতী' শব্দানুষঙ্গের অব্যর্থ প্রয়োগ।" (আকতার, ২০১৩ : ২৫৭)। সমালোচকের এই মন্তব্যে আহসান হাবীবের কালসচেতনতা স্বীকৃত হয়েছে। সেইসঙ্গে 'সমকালীন জীবনযন্ত্রণা ও উৎকণ্ঠা'র শৈল্পিক অনুরণন হাবীবের কবিতায় 'নতুন মাত্রা'য় উদ্ভাসিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

আহসান হাবীবের 'এই মন — এ মৃত্তিকা' কবিতায় বিপন্ন সময় ও বিদীর্ণ সমাজের দীর্ঘশ্বাসই প্রধানরূপে প্রতীয়মান। এখানে আলোকিত দিনের পলায়নবার্তা ঘোষিত হলেও 'আজো দিগন্তে স্বপ্নের মতো তারি অপরূপ কায়া' কবির আশা জাগানিয়া উচ্চারণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। 'দিন এলো আর দিন গেলো তার চিরচেনা পথ ধরে,/অনেক সূর্য আর বহু মেঘ সেই পথে গেলো ঝ'রে' ('এই মন — এ মৃত্তিকা'/*রাত্রিশেষ*) — এই চরণদ্বয়ে চলমান সময়ের পায়ের শব্দ যেমন শোনা যায়, তেমনি তার পায়ের চিহ্নও এতে ধরা পড়েছে। 'আজকের কবিতা'য় সময়ের উপস্থিতি প্রবল এবং সমাজদেহের ক্ষতস্থানগুলোও

কবির কথার আড়ালে হারিয়ে যায় নি। যে বিপ্লবযুগের ছবি এঁকেছেন কবি, সেখানে বিপ্লবের মুখ কীভাবে মুখোশের মধ্যে মিলিয়ে যায়, সেই কথাও বলেছেন :

তোমার আমার দিন ফুরায়েছে যুগটাই নাকি বৈপ্লবিক–
গানের পাখিরা নাম সই করে নীচ লিখে দেয় রাজনীতিক
থাকতে কি চাও নির্বিরোধ?
রক্তেই হবে সে ঋণ শোধ।
নীড় প্রলোভন নিরাপদ নয় বোমারু বিমান আকস্মিক
আরব্ধ গান এইখানে শেষ আজকে আহত সুরের পিক।
('আজকের কবিতা'/*রাত্রিশেষ*)

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের প্রতিনিধিত্বশীল কবিতার ধারা প্রগতি-কবিতার অনুরণন উপরিউক্ত কবিতায় স্পষ্ট। সৌখিন রাজনীতির ডামাডোল সমাজ-পরিবর্তনে কোনো ভূমিকা রাখবে না — এই উপলব্ধি কবির রাজনৈতিক বিবেচনাকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ দিনের ছায়াপাত কবির স্বকালমগ্নতারই স্বাক্ষর বহন করে।

'কোনো বাদশা'যাদীর প্রতি' কবিতার পোশাকটি প্রেমের হলেও কবি এর অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন যুদ্ধবিধ্বস্ত সেই দগ্ধদিনের দুঃসহ স্মৃতি। যুদ্ধের দিনগুলিতে নিম্নবর্গের মানুষকেই বেশি কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। কবি এই কবিতায় সেই শ্রমজীবী মানুষের কষ্টের কথাই ভালোবাসার আবহে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। "শুধু সমাজ-সম্পৃক্তি নয়, সমাজের নীচের তলার মানুষও তাঁর কাব্যে এসেছে, যেন কবি অঙ্গীকারাবদ্ধ সমাজের মানুষের প্রতি, তাদের জীবন ও জীবন-যাপনের প্রতি। 'কোনো বাদশা'যাদীর প্রতি' কবিতায় আমরা সেইসব মানুষদের পাই।" (তুষার, ১৯৮৫ : ৯)। এই কবিতার নায়ক তাঁর প্রেয়সীকে নিয়ে খেতে যাবে সস্তা দামের ছকু মিয়ার হোটেলে এবং খাবার শেষ করে ছেলেটি ফিরবে 'তিন নম্বর হাবু মিয়ার বস্তি'তে। কবির মানসভ্রমণ কখনোই সময় ও সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বলেই প্রেমের কবিতায় নায়কের দুর্দশার কথাও তিনি বলতে ভোলেন না।

'কনফেশান' কবিতায় হাবীব মধ্যবিত্তের স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে তুলে ধরেছেন। নিরন্ন ও বিপন্ন মানুষদের নিয়ে বিলাসী ভাবনা ও সৌখিন রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা এই কবিতায় চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন কবি। পেটে ক্ষুধা রেখে বাইরের ঠাট বজায় রাখার মতো ভণ্ডামিতে অভ্যস্ত মধ্যবিত্তের ঝুঁকিমুক্ত সুন্দর জীবনের অসম্ভব প্রত্যাশা এই কবিতায় চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে। কবিতাটির অন্তর্গত অনুরণন পাঠককে নিশ্চয়ই সমর সেনের কবিতার কথা মনে করিয়ে দেবে। মধ্যবিত্তের আত্মচরিতমূলক অভিব্যক্তি সমর সেন কবিতায় ধারণ করেছেন এইভাবে :

কিন্তু জড়বাদী সুবুদ্ধির জোরে আজ আমি
দু-নৌকায় স্বচ্ছন্দে পা দিয়ে চলি,
বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর
ভগবান এ কবিকে বিপুলা যশোদা
নিশ্চয় দেবেন বলে আমার বিশ্বাস। ('২২শে জুন'/*সমর সেনের কবিতা*)

সমর সেন যখন 'আমি রোমান্টিক কবি নই, আমি মার্ক্সিস্ট' — এই স্বীকারোক্তির পর মার্কসপন্থার আড়ালে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার মধ্যবিত্তীয় কলাকৌশল বিবৃত করেন, তেমনি আহসান হাবীবও 'প্রোলেটারিয়ান' শব্দের দোহাই দিয়ে মানুষের অন্তর ও ঘরের অন্দরমহলের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন :

আমরা কবিতা লিখি : 'প্রোলেটারিয়ান'।
রক্তে ও মজ্জায় শা'জাহানী স্বপ্ন।
সিথানে শিথিলবাহু জঠরে আগুন,
বনেদী মনের বনে ডানা মেলে কবুতর নাচছে।
আমাদের উলঙ্গ বক্ষের
আমাদের ঘুণধরা পাঁজরের
চারপাশে অহরহ ওড়ায় অনেক ধূলি
তীক্ষ্ণ ক্ষুর আরবী ঘোড়ার।
জংধরা মগজের নীলকোষে অসহ তুফান। ('কনফেশান'/*রাত্রিশেষ*)

'আমাদের দুইমুখো মন' — এই উচ্চারণ চল্লিশের প্রগতি-কবিতার ধারাকেই মনে করিয়ে দেয় এবং সমাজসংলগ্ন কবির এই অনুভূতি তাঁর স্বকালের সমাজ-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সামনে মেলে ধরে। 'দিনের সুর' এবং 'অপঘাত' কবিতার নামকরণের মধ্যেই সময়-সমাজের নানা চিহ্ন পরিস্ফুট।

আহসান হাবীব *রাত্রিশেষ*-এর 'প্রান্তিক' পর্যায়ের কবিতায়ও সময়কে নানাভাবে ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন 'বাইশে শ্রাবণ' কবিতায় যেন 'শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস'— এই রবীন্দ্র-অনুভবেরই বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছেন কবি। কবি দেখেছেন 'লক্ষ লক্ষ মানুষের সিক্তপক্ষ আঁখির প্রসাদ/অশ্রুসিক্ত বন্ধনের স্বাদ।' কবি কায়কোবাদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত 'অস্তপারের আকাশকে' কবিতায় ইতিহাসের নানা অনুষঙ্গে আহসান হাবীব তাঁর স্বকালকে চিত্রিত করেছেন। যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে ইতিহাস মানুষকে বারবার সতর্ক করে দিলেও ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নেওয়ার পরিণতি কত ভয়াবহ হতে পারে সেই কথা বলেছেন কবি। কবির ভাবলোকে 'যে অবিনশ্বর ইতিহাস কথা কইছে' তাতে কর্ণপাত না করার বিপদ সম্পর্কে তিনি সচেতন। অবিচ্ছেদ্য ইতিহাসের কাছে কবি তাঁর অহঙ্কারের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করেছেন এবং 'উদয়-তোরণের নতুন সূর্য' যে বার্তা বয়ে আনে তাকে প্রণতি জানানোর কথা বলেছেন। 'সেতু-শতক' কবিতায় যুদ্ধবাজ পরাশক্তির বিমানবিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কবির উচ্চারণ নতুন মাত্রা পেয়েছে। এই হিংস্রতার কারণেই কবির 'নয়নে কাঁপে মীরণের তীক্ষ্ণ তলোয়ার'। পলাশীর যুদ্ধের স্মৃতির সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহকে সন্নিহিত করে যুগে যুগে যুদ্ধ কীভাবে মানুষের সুখ, সম্পদ ও সম্ভ্রম হরণ করে নিয়েছে, আহসান হাবীব সেই ছবি এঁকেছেন :

দুই শতাব্দী ঘুম কোন্ দস্যু করেছে হরণ!
কলঙ্কের কালিমায় কোন দস্যু হেনেছে মরণ!
সেই মৃত্যু দ্বারে দ্বারে হেনে যায় অশান্ত আঘাত,
আমার মৃত্যুরে দাও জীবনের তীক্ষ্ণ প্রতিঘাত! ('সেতু-শতক'/*রাত্রিশেষ*)

'প্রতিভাস' পর্যায়ে কবির সময় ও সমাজ-নিরীক্ষা আরো তীব্র ও তীক্ষ্ণ রূপে ধরা দিয়েছে। 'সৈনিক' কবিতায় কবির অভিজ্ঞান বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতাকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। সেই দুর্দিনে কবি সবাইকে সৈনিক হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। বিশ্বযুদ্ধের বর্ণনা নয়, জীবনযুদ্ধের নির্মমতাই সেখানে প্রধানরূপে প্রতীয়মান। প্রসঙ্গত ফজলুল হক সৈকতের একটি মন্তব্য স্মরণীয় :

> এ দুর্বিষহ জীবন-যাপন যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের তন্ত্রীতে চেতনায় যে প্রবল অনুভূতির স্বাক্ষর এঁকেছে তাই চিত্রিত হয়েছে আহসান হাবীবের কবিতায়। সমাজের সঙ্গে, সমাজের মানুষের সঙ্গে, সামাজিক বোধের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর সম্পর্ক এবং এ সম্পর্ক আজন্ম লালিত। কবিতায় তাঁর সামাজিক অনুভূতি এসেছে সচেতনতার প্রচ্ছন্ন মায়ায় আবদ্ধ হয়ে। সামাজিক সংকটে জীবনের গতায়াতকে তিনি যুদ্ধ ভেবেছেন। (২০০২ : ৩২)

যারা প্রতিনিয়ত সঙিন উদ্যত রেখে মানুষকে ভয় দেখায় তাদের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র নির্বেদ মানুষের যুদ্ধের ধরন সম্পর্কে কবির অভিব্যক্তি ধরা পড়েছে এই কবিতায়। দুর্দিনের থাবা থেকে বাঁচাতে গৃহিণীরা তাঁদের প্রিয়মানুষদের 'দুগ্ধপোষ্য শিশুসম' লুকিয়ে রাখে, কিন্তু বেঁচে থাকার রসদ জোগাতে তাদের দাঁড়াতেই হয় 'কিউ'য়েতে :

> মাসান্তের মাসোহারা অর্ধেক বিলিয়ে দেই
> একটি বস্ত্রের বিনিময়ে,
> কলম-কাগজ কেনা একেবারে ছেড়ে দিয়ে
> খোকাদের যেতে দেই ব'য়ে!
> বিনয়ী মেঘের মত সন্ধ্যাবেলা একে একে
> সার বেঁধে রাস্তায় দাঁড়াই।
> 'কিউ'য়েতে দাঁড়িয়ে থেকে (রোমান্টিক নাম বটে)
> আমরা 'কিউ' হয়ে যাই! ('সৈনিক'/*রাত্রিশেষ*)

১৯৪৩-এর মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত আহসান হাবীবের কয়েকটি কবিতার সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। তেরশ' পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ বিশ শতকের চল্লিশের দশকের সকল কবিকেই ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং সেই সময়ের প্রত্যেকের কবিতায়ই আমরা এই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা মুদ্রিত হতে দেখি। 'মন্বন্তরকালীন পরিস্থিতি ও মানুষজনের দুঃখ-দুর্দশায় অভিভূত কবিকুলের হৃদয়বেদনা এ-সমস্ত কবিতায় উদ্ঘাটিত।' (বিনতা, ১৯৯৭ : ১৮০-৮১)। কারো কারো কবিতায় দুর্ভিক্ষের কারণ চিহ্নিতকরণের প্রয়াসও লক্ষ করা যাবে। বাংলা কবিতায় মন্বন্তরের প্রভাব সম্পর্কে একজন সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> বাঙালি কবি সাহিত্যিকেরা দুর্ভিক্ষের কারণ ও লক্ষণের মধ্যে প্রভেদটা বুঝেছিলেন ভালো করেই। সেই বোধ কম বেশি প্রকাশ পেয়েছে এঁদের সৃষ্টিতে। সরকারের প্রতি এঁরা ক্রোধ প্রকাশ করেছেন, মজুতদারদের প্রতি ঘৃণা। জেনেছেন, আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত হয়েছে মানবতা। কিন্তু এও তাঁরা দেখেছেন যে, মনুষ্যত্ব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে বারেবারেই। ভাবতে চেষ্টা করেছেন শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে মানবতাই। (স্বপন, ২০০৪ : ১০৮)

আহসান হাবীব 'একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ' কবিতায় স্মৃতির ভেতর দিয়ে পল্লি-প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। সেখানে যুদ্ধবিধ্বস্ত জনজীবনের ছবি যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি যুদ্ধের পরিণাম হিসেবে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতাও প্রতিভাসিত। তাই সেখানেও 'শূন্য মাঠ/চলে না পথিক,/প্রেতের ডানার তলে,/দুঃস্বপ্নে দীর্ঘ রাত কাটে।' ('একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ'/*রাত্রিশেষ*)। যুদ্ধের পরিণতি হিসেবে আসে দুর্ভিক্ষ এবং মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয় 'শতাব্দীর গ'ড়ে ওঠা এইসব গ্রাম'। 'হাসি' কবিতায় যুদ্ধবাজ মানুষের হাসির নির্লজ্জ ও কুৎসিত দিকটাকে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। তাই সেই হাসি কবিকে 'তীক্ষ্ণ চাবুক মারে' এবং সেই সঙ্গে 'আরো অনেককে'। 'কয়েদী' কবিতায়ও বিপন্ন দিনের ছবি স্পষ্ট, তবে এই কবিতায় কবি উত্তরণ-প্রত্যাশায় উদ্দীপিত হয়েছেন : 'আছে সেই অনাগত দিন/হাতে আছে সেই সূর্য-পরিক্রমা স্বপ্ন রঙিন।' বিপন্ন সময়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা মানে তো নিজের চারদিকে কয়েদখানা রচনা করা। কবি এই কয়েদখানা ভেঙে মানুষকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানান।

'পদক্ষেপ' পর্যায়ের কবিতায় আহসান হাবীবের আশাবাদী উচ্চারণ আরো তীক্ষ্ণ হয়েছে। 'ঝরা পলাশ' কবিতায় পরাশক্তির 'নির্লজ্জ হৃদয়ে' যখন 'বাসনার সোনা' ছায়া ফেলেছে, তখন কবির 'নতুন বাসার আশা তবু চিত্তে করে আনাগোনা'। তাই কবি ইতিহাসের পরম্পরা থেকে শিক্ষা নিয়ে 'ইস্পাত-কঠিন এক দিন রচনার' স্বপ্ন দেখেছেন। "নৈরাশ্য, হতাশা, ক্লান্তি, অবসাদ, একাকিত্ব, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে রূপ দিতে দিতে কবি এই 'পদক্ষেপ' পর্যায়ে এসে রীতিমতো ধনাত্মক (positive) ও আশাবাদী হয়ে উঠেছেন।" (তুষার, ১৯৮৫ : ১২)। তাই তিনি মানুষকে দুঃখের দীর্ঘ নদীতে নিয়ে গেছেন এবং আত্মপ্রত্যয়ী মাঝির মতো তাদের মনে তীরের প্রত্যাশা জাগিয়ে রেখেছেন। সময়ের কাছে নতজানু না হওয়ার এই অভিজ্ঞতাও সেই বৈরী সময়ের কাছ থেকেই লাভ করেছেন কবি। সময়-সমাজ-রাজনীতির অবক্ষয়ী দৃশ্যের পাশেই কবি সাজিয়ে রাখেন জীবনের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসার প্রত্যয়ী উচ্চারণ :

ক. সে আগুন ধূমায়িত পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড তলে!
এ আগুন আসে যায় পরিচিত পথে
মধ্যদিনে এ আগুন দেখা দেয় এই রাজপথে,
এই চেনা আগুনের পুরনো ছায়ায়
আরেক আগুন এসে আশা রেখে যায়! ('আগুন'/*রাত্রিশেষ*)

খ. আজ হতে
দুর্বহ পাপের বোঝা দিনে দিনে লঘু করিবার
প্রতিজ্ঞা আমার! ('স্বাক্ষর'/*রাত্রিশেষ*)

গ. এই মৃত্যু পথে পথে রেখে যায় মৃত্যুহীন নাম,
এই মৃত্যু রেখে যায় মুক্তপ্রাণ কঠিন সংগ্রাম
সংঘবদ্ধ জীবনের। ('মৃত্যু'/*রাত্রিশেষ*)

'রেড রোডে রাত্রিশেষ' কবিতাটিতেই আহসান হাবীবের উত্তরণ-উন্মুখ অভিজ্ঞান স্ফটিকসংহতি লাভ করেছে বলা যায়। পুরো কাব্যের মৌল প্রবণতাকে তিনি এই কবিতায় সূত্রাবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন। বিকলাঙ্গ সময়ের গর্ভজাত অন্ধকারকে দু'হাতে সরিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাকুল বাসনাই এই কবিতার মর্মে গেঁথে দিয়েছেন কবি। 'রাত যত গভীর হয় প্রভাত তত নিকটে আসে' — এই প্রবাদপ্রতিম উচ্চারণের অনুরণন শুনতে পাই হাবীবের কবিতায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় *কাল মধুমাস* কাব্যের 'এদিকে' কবিতায় যেমন বলেন, 'ভোর হবে। তাই অন্ধকার ব্যথায় মোচড়ায় ॥' (সুভাষ, ২০০৩ : ২/১৩১), তেমনি আহসান হাবীবও উত্তরণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়ার কথা বলেছেন। আহসান হাবীবের 'এ প্রতিজ্ঞা অন্ধকার কেটে গিয়ে আলোর মুখ দেখার প্রতিজ্ঞা, আলোহীন খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে অবাধ, উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার আরেক নাম। (তারেক, ২০০৯ : ১৭)। তাই কবি লক্ষ করেন, 'রেড্ রোডের দু'পাশে/তীক্ষ্ণ চোখ জ্বালিয়ে/অন্ধকার শয়তানের পাহারা' এখন মুমূর্ষু রোগীর মতোই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মানবসভ্যতার শত্রু পরধনলোভী শয়তানের চেহারায় এত দিনের যত্নে গড়া যে লাবণ্য, তাতে ফাটল দেখতে পান কবি, আর 'তার ফাটলে বুঝি শেষ রাত্রির কান্না'। কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক :

> অথবা ঘাটে বাঁধা অনেক দূরের জাহাজ,
> যারা পার ক'রে দেয় পলাতক অন্ধকারকে
> নিরাপত্তার পাল তুলে!
> এরা সেই আপনি গড়া খেয়া নৌকোয় হয়তো —
> পেরিয়ে যাবে গঙ্গা
> মিলিয়ে যাবে পশ্চিম সীমান্তে,
> নদীর জলে ঝলকে উঠবে মুক্তি,
> বন্যা আসবে রেড্ রোডের প্রান্তে
> কেন না
> এদিকে আবার জাগবে নতুন সূর্য।
> ('রেড্ রোডে রাত্রিশেষ'/*রাত্রিশেষ*)

এই নতুন সূর্যের জন্য শান্তিপ্রিয় মেহনতি মানুষকে আন্দোলন-সংগ্রামের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। কবি তাদের ত্যাগের মহিমা এই কবিতায় ধারণ করেছেন। যে কোনো মহৎ অর্জনের জন্যই মানুষকে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে মানুষ একসময় চলার শক্তিও হারিয়ে ফেলে। তাই কবি সেই মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন, যারা বিরুদ্ধ সময়কে প্রতিহত করে কাঙ্ক্ষিত দিনের দিকে ধাবিত হতে পারে। কবিতাটি সম্পর্কে হোসেন উদ্দিন হোসেনের মন্তব্য স্মরণ করা যাক :

> যে রাত্রি পাহাড়ের মতো অটল, অবিচল অর্থাৎ জাতীয় জীবনে যে পরাধীনতার অটল অন্ধকার, নিপীড়িত জাতিসত্তা শতাব্দীকালের অন্তহীন নাগপাশে আবদ্ধ, সেই পরাধীন জাতীয় জীবনের অন্ধকারময় অধ্যায়ের পতন ঘটেছে। আশাবাদী কবি মুক্তির আলোকময় দিগন্তের আভাস মনে মনে উপলব্ধি করেছেন এখানে। বিভাগপূর্ব ভারতের জনজীবনের মুখর স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিময় প্রাণপ্রবাহের উচ্ছলতা কবির অন্তরে যে প্রেরণা জুগিয়েছিলো, এই কবিতা তারই ফলশ্রুতি। (হোসেন, ১৯৯৪ : ১২)

রাত্রিশেষ কাব্যে আহসান হাবীব তীব্রভাবে স্বকালমগ্ন। রফিকুল ইসলাম (১৯৭১) *আধুনিক কবিতা*-র ভূমিকায় যথার্থই বলেছেন, "যে আবেগ থেকে আহসান হাবীবের 'রাত্রিশেষে'র অনেকগুলি কবিতা উৎসারিত তা হলো সমাজ সম্পৃক্তি বোধ, ত্রিশোত্তর কবিতার যা একটি প্রধান ধারা।" অস্থির সময়ের বিপন্ন বাস্তবতাকে তিনি কবিতায় ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। সমাজের অন্তর্গত অসুখের বয়ান কাব্যিক অবয়বেই আহসান হাবীবের কবিতায় উপস্থাপিত। এ-প্রসঙ্গে হাসান হাফিজুর রহমানের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য : 'আহসান হাবীবের কাব্য ... এমন এক যুগচিহ্নকে রূপায়িত করার প্রয়াসে নিবেদিত, যখন সংকট, স্ববিরোধিতা, আশা, আস্থা আর বিদীর্ণ হতাশা একসঙ্গে বাংলা সমাজকে আলোড়িত করে তুলেছে।' (হাসান, ১৯৯৪ : ৪৬৬)। রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে স্বার্থমগ্ন মানুষের ভূমিকা সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন আহসান হাবীব। ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনের প্রয়োজনে সুবিধাবাদী মানুষ কীভাবে নিজেদের রঙ বদলে নিয়ে ক্ষমতার নিকটবর্তী হয়, সেই দৃশ্যও তাঁর কবিতায় উপস্থিত।

আহসান হাবীব *ছায়া হরিণ (১৯৬২)* কাব্যেও বিকলাঙ্গ সময়ের অস্থির, অসুস্থ ও বিক্ষুব্ধ মানসতাকে ধারণ করেছেন। সময়ের কাছ থেকেই তিনি গ্রহণ করেছেন তাঁর শিল্পের আয়ুধ। এই গ্রন্থভুক্ত কবিতাবলি ১৯৪৭ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত কালখণ্ডে রচিত। 'সমসাময়িক যুগ ও যুগযন্ত্রণার বিষাক্ত ছোবলের চিহ্ন'যুক্ত *ছায়া হরিণে*র বিষয়বস্তু সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেছেন :

> এই কবিতাগুলি সেইসময়ের রচনা যখন সুকুমার মূল্যবোধের উপর রক্তাক্ত হাত রেখেছে বণিক সভ্যতা। অবক্ষয়ে, ঐশ্বর্যের আস্ফালনে, জোতদারের শোষণে, ক্লেদে ও কদর্যতায় সমাজ ছিল আবিল। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর ও নবতর স্বাধীনতার পর নানাবিধ জটিলতা, কাব্যচেতনায় স্বাক্ষর রেখেছিল — এ কাব্যের কবিতাগুলো সেই অস্থির সময়ের জীবনভাষ্য। (দিলারা, ২০০২ : ৩৪)

বর্তমানের অসুস্থ সমাজ-প্রতিবেশ তাঁকে আহত করেছে বলেই তিনি বারবার ফিরে গেছেন সমৃদ্ধ অতীতের কাছে। একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন, 'ভাঙাচোরা দেয়ালের স্তূপাকার পুরনো ইঁটের/ইতিহাস-লাবণ্যের কিছু আভা পাওয়া যায় টের।' ('জীবন'/*ছায়া হরিণ*)। এই ভাঙাচোরা যন্ত্রণার জঞ্জাল সরিয়ে তিনি নতুন নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন। সময়ের কাছ থেকে নানা বর্ণের পাথর সংগ্রহ করে 'প্রেমে ও সংগ্রামে' জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে চান কবি। বর্তমানকে রূপায়ণের প্রয়োজনেই তিনি ঐতিহ্যের শরণ নেন। তিনি বিশ্বাস করেন, সময়ের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হলে সময় একজন সৃজনশীল মানুষকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেয় না কখনো। সময়কে বুঝতে হয় এবং সময়ের গভীরে ডুব দিয়েই খুঁজে নিতে হয় শিল্পের নানা অনুষঙ্গ :

> কুড়িয়ে যা পাই
> তাই নিয়ে নিত্য নব জীবন বানাই।
> সামান্য যা পাই তাই অসামান্য আবেগে অশেষ
> তার সাথে জীবনের শ্রান্তিহীন এই পরিবেশ
> রৌদ্রদগ্ধ দিন আর অরণ্যের ছায়ার প্রসাদ

রাত্রির আকাশ ঘিরে জেগে থাকে চাঁদ;
আশা জাগে ভাষা পাই মনে পাই গভীর আশ্বাস।
লিখি ইতিহাস
আগামী দিনের এক পৃথিবী প্রাচুর্যের গান।
অনাগত মানুষের প্রাণ
পৃথিবীর পথে পথে দিয়ে যাই সহজে জাগিয়ে
মনের মাধুর্য আর হাতের সবল মুঠি দিয়ে। ('জীবন'/*ছায়া হরিণ*)

'ক্রান্তিকাল' কবিতায় আহসান হাবীব যুদ্ধবিধ্বস্ত সময় ও সমাজের ক্ষত ও ক্ষরণ বিষয়ে কথা বলেছেন। তিনি যখন মধ্যরাতে রাজপথে পরিত্যক্ত নারীদেহ আবিষ্কার করেন, তখন তাঁর মনে হয়, এই নারীই একদিন এই পৃথিবীর নায়িকা ছিল। বণিক-সভ্যতা কীভাবে মানুষকে পণ্যে পরিণত করে, কীভাবে নারীদেহের লাবণ্যকে টাকার বিনিময়ে অধিকার করে নেয় এবং প্রয়োজন শেষে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে, সেই ছবিই এই কবিতায় বিধৃত। কবি যখন বলেন, 'একদিন এই নারী ইতিহাস-বিন্যাসের ভার/নিয়েছিল নিজ দেহে,/পৃথিবীর সঙ্গীত-সভার/যে নারী সম্রাজ্ঞী ছিলো/অন্ধকার রাত্রির প্রহরে/আজ দেখি সেই নারী রাজপথে আর্তনাদ করে।' ('ক্রান্তিকাল'/*ছায়া হরিণ*) — তখন অসুস্থ সময়ের বিকৃত মানুষের মিছিলই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে। লোভ-লালসায় পরিকীর্ণ পৃথিবীর ছবি এই কবিতায় ধরা পড়েছে। এই কবিতায় হাবীব যে পৃথিবীর কথা বলছেন, সেখানে মানুষ মানুষের জন্য নয়; আত্মস্বার্থ ও বিলাসী জীবনযাপনের জন্য মানুষ বন্য হয়ে উঠেছে। এই অন্ধকার পৃথিবীর ভ্রষ্ট মানুষগুলোই শান্তিপ্রিয় মানুষের জীবন ও জীবিকার সুস্থ পরিবেশ নষ্ট করে ফেলছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বৈশ্বিক বাস্তবতাকে কবি এক বিপন্ন নারীর রূপকল্পে তুলে ধরেছেন :

লালসার পাশব লুণ্ঠন
ঘটে গেছে। অতঃপর এই নারী খুলেছে গুণ্ঠন
জনহীন রাজপথে অন্ধকারে ক্লান্ত দুই হাতে
আর তার সাথে
সভ্যতা-নারীর হাটে দেখি শত আকুঞ্চিত ভাল
ভয়ে ভীত শত শত সভ্যতার চতুর দালাল।
('ক্রান্তিকাল'/*ছায়া হরিণ*)

'ইতিহাস-বিন্যাসের পথে' কবিতায় আহসান হাবীব আঠারোশো সাতান্নর ঝড়ের কথা বলেছেন এবং সেই ঝড়ে মানুষ ও ঘরবাড়ি, অরণ্য ও পশুপাখির বিপন্নতার ছবি এঁকেছেন। এই ঝড়ের আবহে তিনি তুলে ধরেন তাঁর সময়ের জনমানুষের জীবনের দুর্দশার ছবি। 'চরিতাখ্যান : নববর্ষ' কবিতায়ও নববর্ষের নানা উদ্‌যাপনের পাশাপাশি তিনি তুলে ধরেন মানুষের দুর্দশার চিত্র। এই কবিতায়ও আমরা একজন নারীর মুখ দেখতে পাই, যার দেহ মৃত্যুর মতন শীতল : 'কুৎসিত কর্কশ তার নগ্ন হাত/মুখে তার মরীচিকা-রঙ/কোনো এক মায়াবিনী নারীর মুখের,/বুকে তার মরুতৃষ্ণা?' এই মরুতৃষ্ণা এখানে নারীর কামনা-বাসনার প্রতিরূপ নয়, বরং জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গের প্রতীক। তাই যখন কবির 'দুয়ারে প্রশ্নের ঢেউ ভেঙে পড়ে আবেগে উচ্ছ্বাসে', তখন কবি সময়ের বহমানতার দিকে

তাকিয়ে অনুভব করেন, সময় চলে গেলেও রেখে যায় 'বৎসরের প্রান্তে কিছু কথা আর গান'। কে কবে কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারই হিসেব মেলাতে চান কবি। অপেক্ষার ইস্পাত-কঠিন দিনের দৃশ্য কবির চোখে ধরা পড়ে এইভাবে : 'আর সেই দিনের মহিমা/মহত্তর বাণী তার, রাত্রিদিন পীড়নের সীমা/পথে ও প্রান্তরে আজো ব্যাপ্ত করে।' তিনি অঙ্কন করেন নববর্ষের নানা আয়োজনের অসারতা এবং লক্ষ করেন, ধূসর জীবনের দুর্বহ বোঝা কাঁধে নিয়ে 'কে যায় কে আসে'। এই আসা-যাওয়ার পথের ধারে বসেই আহসান হাবীব বিপন্ন মানুষের মর্মঘাতী বেদনার চলচ্ছবি দেখেন।

'হক নাম ভরসা' আহসান হাবীবের একটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা যেখানে চিঠির আদলে কবি সাধারণ মানুষের দুঃসহ দিনের ছবি এঁকেছেন। হুজুরের কাছে কবির যে নিবেদন এই কবিতায় বিধৃত, তাতে শ্রমশোষণের ছবি পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য কীভাবে মানুষকে ভিটেমাটি ছাড়া করছে, কবি সেই কাহিনি বয়ান করেছেন। পত্রলেখক জীবনের সাতান্নটি বছর যে মাটিতে কাটিয়েছেন, যে মাটির সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক, সেই মাটির সঙ্গে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে। ক্ষুধার রাজ্যে যে পৃথিবী কঠিন কর্কশ গদ্যময় হয়ে ওঠে, সেই পৃথিবীতে যন্ত্রণাকাতর মানুষের পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেওয়ার মতো পাশবিক প্রবণতায় ক্ষুব্ধ কবি বলছেন, জমির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের মাধ্যমে জমিদারের সঙ্গেও সব হিসেব চুকে গেছে। আহসান হাবীবের ভাষায় :

যখন চুকিয়ে দিয়ে এসেছি, তখন
আর কি কারণ
ভয় করে কথা কই
আমি ত এখন আপনার প্রজা নই,
আর ত আপনার মাখা তামাক খাই না
নিজে মাখি নিজে খাই কোথাও যাই না।
('হক নাম ভরসা'/*ছায়া হরিণ*)

কেবল হতাশা ও জীর্ণ জীবনের কথাই বলেন নি কবি, এই শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নেওয়ার কথাও বলেছেন তিনি। এই কবিতাটি সম্পর্কে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মন্তব্য : "তাঁর কবিতার মহম্মদ তালেবালি কথা বলে সাফ সাফ, ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষের পরে 'হক নাম ভরসা' করে জমিদারকে সে জানিয়ে দেয় 'আপনার মাখা তামাক খাই না/নিজে মাখি নিজে খাই কোথাও যাই না' তবে ভয়টা কিসের? এ কথাটা কবিও বলেন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভঙ্গিতে।" (সিরাজুল, ১৯৮৭ : ৬৭)। প্রলেতারিয়েতের নিজের জীবন ছাড়া হারানোর কিছু নেই বলেই মাথা তুলে দাঁড়ানোর কথা বলেন তিনি। পুরনো লাঙল আর কাস্তে শানিয়ে নিয়ে 'আবার জিগরফাটা রক্ত দিয়ে লাল' নিশান বানানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এবং 'আমাদের জিন্দিগীর শান কেড়ে' নেয়ার মতলব করে যারা, তাদের গর্দান কাটার উপযুক্ত ঢাল তলোয়ার প্রস্তুত করেন কবি : 'এখন/ আমরা, কজন,/পুরনো মরাই কটা সারাবো এবং/পুরনো লাঙল এনে দিতে হবে রং/সং সেজে বসে থাকা সাজে না, কারণ বেলাশেষ।' ('হক নাম ভরসা'/*ছায়া হরিণ*)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী দুর্ভিক্ষের ছবি সংবলিত 'তেরশ' একান্ন সাল, বারোই আষাঢ়' তারিখে লেখা এই

পত্রের লেখক আমানীর পাড়ের মহম্মদ তালেবালি। এই কবিতাটিকে সামনে রেখে কবির 'ছহি জঙ্গেনামা' কবিতাটি পাঠ করা যেতে পারে। এখানেও পুথির আদলে কবি যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীর বিপন্ন মানুষের কথা বলেছেন।

'পুনর্বাসন' কবিতায়ও চিত্রিত হয়েছে সময় ও সমাজের ভেতরের ভাঙাচোরা অবস্থা। তবে এই কবিতায় মানুষের জীবনের দুর্দশা থেকে উত্তরণের কথা বলেছেন কবি। তিনি উপলব্ধি করেন, 'বহু লক্ষ অন্ধকার রাতকে পেরিয়ে/ নাইলের প্রান্তরে এসে ভোর হলো।/ মনে হলো সকালের সূর্যের সোনায়/ আরেকটি অপরূপ রঙ্ লেগে আছে।' ('পুনর্বাসন'/*ছায়া হরিণ*)। নীড়হারা মানুষের এই বিপন্ন বাস্তবতার কারণ চিহ্নিত করেছেন কবি : 'আমাদের বহু নীড় লালসার বে-আইনী হানায়/জ্বলে গেছে! আমরা উদ্বাস্তু তাই।' পুরনো পৃথিবীর জীর্ণতা মুছে নিয়ে কবি নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার কথা বলেছেন।

'প্রেম নারী মানুষ ঘোষণা' কবিতায় আহসান হাবীবের মানসগঠনের মৌল প্রবণতা সংহত রূপ পেয়েছে। এখানে সময়-সমাজ-রাজনীতি সবকিছুই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। কবি বলছেন 'যুদ্ধ-হত্যা লুণ্ঠনের উল্লাসের মুখে/যে পৃথিবী শঙ্কায় আকুল;/আমি সেই পৃথিবীর সতর্ক সন্তান।' ('প্রেম নারী মানুষ ঘোষণা'/*ছায়া হরিণ*)। তিনি তাঁর কবিতাকে বিপন্ন পৃথিবীতে শান্তির দূত হিসেবে পাঠাতে চান। বণিক সভ্যতার বীভৎস রূপটি এই কবিতায় তুলে এনেছেন কবি। 'কুৎসিত কুটিল কামনার' বিষে নীল হয়ে যাওয়া পৃথিবীতে বসে কবি আত্মমগ্ন প্রেমের কবিতা লিখতে চান নি। তিনি তাঁর কবিতাকে 'সংগ্রামের অজেয় বিষাণ' হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। নারী, নারীর হৃদয়, প্রেম, শান্তি এবং 'পৃথিবীর শান্তিহারা মানুষের নামে' কবির এই শপথ কবিতাটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। 'যৌবনে জীবনে তুমি', 'পারাপার', 'অন্যদিন', 'শুক্লপক্ষের গান' ইত্যাদি কবিতায়ও কবির স্বকালকে আমরা স্পষ্টভাবে মুদ্রিত হতে দেখি। সমাজের অন্তর্গত অসুস্থতা ও অস্থিরতার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন কবি। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক প্রত্যয়ের প্রকাশও এখানে লক্ষ করা যায়। তিনি স্পষ্টভাবে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক আদর্শের কথা বলেন নি, কিন্তু অসাম্যের কদর্য রূপটি নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন।

আহসান হাবীব *ছায়া হরিণ* কাব্যে বিপন্ন মানুষের ছবি আঁকলেও সুন্দর ও আলোকিত দিনের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার দিকেই দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন। তাঁর কবিতায় আমরা খুঁজে পাই 'এমন মানুষ যার নিবিড় যোগ রয়েছে দেশকালের সঙ্গে, সমাজের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে যে প্রতিনিয়ত আপন অস্তিত্ব রক্ষায় উন্মুখ। এই অস্তিত্বের বোধে মানবিক অনুষঙ্গ আর দেশচেতনার কথা তাই খুব সহজেই চলে আসে তাঁর কবিতায়। সেই সঙ্গে তিনি উপজীব্য করে তোলেন সেই আধুনিক মানুষকে যে মৌলিক অর্থেই উৎকেন্দ্রিক, নিজের প্রকৃত অবস্থান থেকে উন্মুলিত।' (মাসুদুজ্জামান, ১৯৯৩ : ২৭৩)। হাবীবের কবিতায় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বিনির্মাণের যে প্রত্যয় উচ্চারিত হয় তা দিনবদলের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার অভিপ্রায় থেকে উৎসারিত।

ছায়া হরিণ কাব্যে চল্লিশের কবিতার সমাজসংশ্লিষ্ট ধারার প্রভাব স্পষ্ট। বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তোলা এবং শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যয়

এখানে কাব্যিক অবয়বে উপস্থাপিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের ছবি আঁকতে গিয়ে কবি কখনো কখনো পুঁজিপতি-মহাজন-জমিদারদের বিমানবিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করেছেন উচ্চৈঃস্বরে। এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরও কবির সময়-সমাজ-রাজনীতি সচেতনতারই পরিচয় বহন করে, কারণ তাঁর স্বকালের কবিরা এভাবেই কবিতায় মানুষের মর্মবেদনাকে ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন এবং কবিতাকে সমাজ-পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

সারা দুপুর (১৯৬৪) কাব্যেও আহসান হাবীব সময় ও সমাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংলগ্ন থেকেছেন। এই কাব্য সম্পর্কে মধুসূদন চক্রবর্তী (১৯৮২) মন্তব্য করেছেন যে, জীবনকে যেমন তিনি বুঝতে চেয়েছেন তেমনি তার সংগ্রামকে উপলব্ধি করেছেন তিনি, সংগ্রামের বিভিন্নতা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতার স্বাক্ষর স্পষ্ট বলেই তা প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে তিনি সপ্রতিভ থেকেছেন। এই বিবেচনায় হাবীবের কবিতায় সমাজ-সম্পৃক্ততার ধারা বহমান থেকেছে বলেই উল্লেখ করেছেন মধুসূদন। শোষণ ও নিপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষের কষ্টের কথা এই কাব্যেও নানাভাবে রূপায়িত হয়েছে। 'প্রাজ্ঞ বণিকের প্রার্থনা' কবিতায় প্রাচীন গ্রীক ধনাঢ্য ব্যক্তি মিডাসকে সামনে রেখে আহসান হাবীব মানুষের অর্থলোলুপতার ভয়াবহতাকে চিত্রিত করেছেন। ধনের দেবতা বাক্‌কাসের অনুগ্রহে মিডাস যা স্পর্শ করে তাই স্বর্ণ হয়ে যায়। এই অর্থলোলুপ মিডাস তার পুত্র-কন্যাকেও স্পর্শের মাধ্যমে স্বর্ণে পরিণত করে। 'এই পৌরাণিক কাহিনী উল্লেখ করে আহসান হাবীব ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সর্বগ্রাসী চিত্র তুলে ধরেছেন।' (তারেক, ২০০৯ : ২৯)। 'এসো সঙ্গী হই' কবিতায় অসুস্থ সময়ে অসহায় মানুষের আর্তনাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই অসুস্থতাই শেষ কথা নয় বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন হাবীব। তাই তিনি সকলের বাসনাকে নতুন দিগন্তে চিত্রিত করার কথা বলেন 'যেখানে প্রসন্ন আকাশ আর কাঁচা মাটি সহজেই/সবার ইচ্ছের অনুরূপ'। 'নতুন কবিতা'য়ও এই উত্তরণের প্রত্যাশাই ব্যক্ত করেছেন কবি। তিনি ভালোবাসাকে দুঃসময়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন :

একতাল নরম মাংসপিণ্ড যদি
ছিন্ন-ভিন্ন হতে থাকে হাওয়ার নখরে
আর তার অবোধ আর্তনাদ
যদি ভেঙে দেয়
পুরনো কবিতার ছন্দ
সে মুহূর্তে তাকে তোমার ভালোবাসাই করুক জয়
('নতুন কবিতা'/*সারা দুপুর*)

সময় কীভাবে কবিতার প্রকরণকলায়ও পরিবর্তন আনে আহসান হাবীব এই কবিতায় তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'তারা দু'জন' শীর্ষক কবিতায়ও হাবীব সময় ও সমাজের অন্তর্গত ভাঙাগড়া কাব্যদেহে পরিবর্তন আনে বলে উল্লেখ করেছেন। 'উত্তীর্ণ প্রহরের গান' কবিতার নামকরণের মধ্যেই রয়েছে নতুন দিনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত। 'এই ঝড়ে অন্ধকারে' কবিতাটিকে ফররুখ আহমদের 'পাঞ্জেরি' কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করা যায়। আহসান হাবীব ঝড়ের কবল থেকে মুক্ত হয়ে 'এ মাটির অকৃত্রিম সন্তান'কে মানুষের কাছাকাছি

থাকার কথা বলেছেন। এই কবিতার তুমি মাঝি না নৌকার যাত্রী তা স্পষ্ট না হলেও বোঝা যায় সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এমন একজন মানুষকেই চিত্রিত করেছেন কবি। কিংবা বলা যায়, কবি নিজের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে নিজের অন্তর্গত শক্তিকে উদ্দীপিত করতে চেয়েছেন। আত্মবোধনের এই উচ্চারণ পাঠককে আলোকিত দিনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। নিচের উদ্ধৃতিটি বিবেচনা করা যাক :

তুমি যদি ভেসে যাও, অস্তিত্ব আমার
তবে কোন্ আশ্বাসের মৃত্তিকায় ভর দিয়ে দাঁড়াবে, আত্মার
এ শিখায় বলো কার পরিচর্যা প্রেমের প্রাণের
আমাকে নতুন কোনো বাসভূমি নতুন মাটিতে
রচনার ইঙ্গিতে নতুন এবং প্রখর কোনো
প্রতিভার স্পর্শ দেবে বলো? ('এই ঝড়ে অন্ধকারে'/*সারা দুপুর*)

'শেষ সন্ধ্যা — প্রথম ঊষা' কবিতায় কবির সময়-সমাজভাবনা চমৎকারভাবে রূপায়িত হয়েছে। এই কবিতায় কবি সময়ের সঙ্গেই কথা বলেছেন। সময়কে কিছুতেই থামানো যায় না, সে আপন গতিতে অগ্রসর হয়। মানুষ কেবল তার জীবনের সামান্য সময়টুকুতে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকে। এই এক জীবনেই সময় মানুষের কাছে নানাভাবে ধরা দেয়। শৈশব-কৈশোর-যৌবন-বার্ধক্য এইসব যেন সময়েরই নানা বিভাজনের নাম। এই বিভাজিত সময়কে আমরা সৃষ্টির ভেতর দিয়ে একটি অখণ্ড অবয়ব দিতে চাই এবং এই অখণ্ডতার শিল্পবিশ্ব নির্মাণের দোহাই দিয়ে পৃথিবীর সমান বয়সী হয়ে উঠতে চাই। আহসান হাবীব যখন বলেন, 'তুমি কাল। অনন্ত কালের/সঙ্গী নই আমি, তবু তার সঙ্গীদের/সঙ্গীতসভায় নিত্য জেগে রবো/মুগ্ধপ্রাণ আমি।' ('শেষ সন্ধ্যা — প্রথম ঊষা'/*সারা দুপুর*) — তখন তাঁর শিল্পিসত্তার অমরতাই ঘোষিত হয়। 'মন বলে' কবিতায় কবি মিছিলকে বিচিত্র অবয়বে অঙ্কনের প্রয়াস পেয়েছেন। এই মিছিল অস্থির সময়ের রূপকল্পে কবিকল্পনায় ধরা দিয়েছে। 'কান্না নেই', 'আশা রাখি মনে' কবিতাদ্বয়েও কবি স্বকালের জীর্ণতা অতিক্রম করে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখেছেন।

'আলো-আঁধারের দর্শন' কবিতায় আহসান হাবীব প্রগতিপন্থী মানুষের সামনে এগিয়ে চলার প্রবল প্রত্যয়কে রক্ষণশীল মানসিকতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। ফুরিয়ে যাওয়া মানুষ যখন বলে 'আশা সে তো মরীচিকা', তখন আশাবাদী মানুষের উচ্চারণ, 'আশাই জীবন, জীবনের শ্রী'। কবি আশাবাদী তারুণ্যের কণ্ঠে শুনতে পান আলোর আবাহন বার্তা। কারণ তারা বিশ্বাস করে, আশায় ভর দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেই নিহিত 'জীবনের দার্শনিক ভাষ্য'। কবি বলেছেন, যারা সামনে এগিয়ে যেতে ভয় পায় তাদের সামনে মৃত্যু অপেক্ষা করছে, আর যারা সময় ও সমাজের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে অগ্রসর হয় তাদের জন্য রয়েছে অনন্ত জীবনের হাতছানি :

আমাদের মধ্যে একজনের গলা শোনা যায় —
যে তার হাতের বইটি আরো শক্ত করে
চেপে ধরেছে হাতের মুঠোয়
সে বলে : ওদের চোখের দিকে যদি

তাকাতে তোমরা পারতে —
আলো ওদের চোখে,
কি উজ্জ্বল আর প্রাণোচ্ছল তার শিখা।'
('আলো-আঁধারের দর্শন'/*সারা দুপুর*)

আহসান হাবীবের কবিতায় বারবার আলোর প্রবেশ লক্ষ করি। আলোর পথযাত্রী হিসেবে তিনি অন্ধকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা বলেন। 'সে আসে', 'তোমার জন্যে' এবং 'সূর্যসঙ্গ' কবিতায়ও এই আলোর পথযাত্রীদের আবাহন করেছেন কবি।

আহসান হাবীব *সারা দুপুর* কাব্যের একাধিক কবিতায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কবিতার বিষয় ও প্রকৌশলে যে পরিবর্তন সূচিত হয় তার কথা বলেছেন। সমাজ-সম্পৃক্ত কবিতার সমৃদ্ধ ধারার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি। মানুষের কথা বলতে গিয়েই তিনি মানুষের শেকড়ের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন, তাদের জীবনযাপনের নানা অনুষঙ্গও সেইসঙ্গে বিবেচনায় এনেছেন কবি। 'অতীতের আয়নায় ভবিষ্যৎকে প্রতিফলিত করে বর্তমানকে তিনি পরিণত করেন অন্তর্লীন আধারে — যে বর্তমান শিল্পের সঙ্গতিকে প্রত্যাশা, অচরিতার্থতা ও বেদনার অভিঘাতে ব্যাহত করতে চায়।' (রফিকউল্লাহ, ২০০২ : ৭৮)। সময় ও সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যেহেতু অবিচ্ছেদ্য, সেহেতু হাবীবের কবিতায় মানুষের দুর্দশার বর্ণনায় আমরা সময় ও সমাজকে প্রবলভাবে উপস্থিত দেখতে পাই।

আশায় বসতি (১৩৮১) কাব্যে আহসান হাবীব আশাভঙ্গের কথাও শুনিয়েছেন। কিন্তু আশা ছেড়ে দিয়ে হতাশায় নিমজ্জিত হন নি তিনি। গ্রন্থভুক্ত কবিতার রচনাকাল সম্পর্কে গ্রন্থের মুখবন্ধে কবি বলেছেন, 'দেশব্যাপী যখন স্বাধিকার আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হচ্ছিলো ক্রমান্বয়ে; সেই দুর্যোগময় দিনগুলিতে ১৯৭১ মার্চ-এর আগে পর্যন্ত লেখা প্রায় সব কবিতাই এই [কাব্যগ্রন্থের] অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।' (আহমদ, ১৯৯৫ : ১৪৫)। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ছায়াপাত এই গ্রন্থে স্পষ্ট। পূর্ববর্তী কবিতাসমূহের ধারাবাহিকতায় মানুষ এবং সমাজের চলমান সমস্যার দিকেও মনোযোগ অক্ষুণ্ন রেখেছেন তিনি। তবে এই গ্রন্থের অনেক কবিতায় আমরা লক্ষ করব, একান্তভাবেই তাঁর আত্মকৃত অনুভবের অনুরণনকে তিনি কবিতা করে তুলছেন। নিজের দিকে ফিরে তাকানোর প্রবণতায় কবিতা শিল্পঋদ্ধ হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বহুজনের কণ্ঠস্বরে যে সংঘচেতনার প্রকাশ ঘটে, তা অনেকাংশে এই গ্রন্থে অনুপস্থিত। 'নৈঃশব্দে নিহিত আমি' কবিতার নামকরণেই আছে ব্যক্তিগত বিবরে ডুব দিয়ে নিজেকে নির্মাণ কিংবা আত্ম-অবলোকনের ইঙ্গিত। 'আমার তেমন কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই' বলে এই গ্রন্থের যাত্রা শুরু হলেও সুন্দর জীবনের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ আমরা অনেক কবিতায়ই লক্ষ করব। *আশায় বসতি*র আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা চিহ্নিত হতে পারে, তা হল স্মৃতিমগ্নতার আধিক্য। এই গ্রন্থের কবিতায় তিনি স্বকালের চেয়ে সেকালের দিকে অধিকতর পক্ষপাত দেখিয়েছেন মনে হয়। এই সেকালে ফেরার মধ্যেই একালের অস্থিরতার নানা পরিচয় পরিস্ফুট। 'স্বগত' কবিতায় তিনি যে জানালা দরজা খুলে দেওয়ার আহ্বান জানান, চোখের সামনের কালো পর্দা সরানোর কথা বলেন, সেখানেও সময়-সমাজ-রাজনীতি অনুপস্থিত নয়। 'দ্বন্দ্ব-সন্দেহ-ভয়ের ভূতটাকে' তিনি আর তাঁর দরোজায় দেখতে চান না, মুক্ত হাওয়ায় বসে রোদের

আরশিতে মুখ দেখতে চান তিনি। এই মুক্ত হাওয়ার সঙ্গে সহজেই কবির স্বাধীন দেশের স্বপ্নকে মিলিয়ে নেওয়া যায়। 'ভোরের বাগানের/সারা বুক জুড়ে/ নতুন কারুকাজ' করা একটি স্বপ্নের নামই বোধকরি বাংলাদেশ। 'মিছিলে অনেক মুখ' কবিতায়ও মুক্তিকামী বাঙালির অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামের কথা বলেছেন কবি :

মিছিলের মুখ দেখো
দেখো তার সারা মুখে দেখো
দেশের আত্মার আভা;
দেখো লক্ষ জনতার প্রাণ
আর দীপ্তিতে জ্বলে মিছিলের সারা মুখে দেখো।
('মিছিলে অনেক মুখ'/*আশায় বসতি*)

এই মিছিলের অন্যরূপ ধরা পড়েছে আহসান হাবীবের 'ডাক' শীর্ষক কবিতায়। কবি তাঁর চারপাশের মানুষের দিকে তাকিয়ে লক্ষ করেন, 'জাগ্রত মিছিল/এখন জাগ্রত-প্রাণ সমর্পিত নদীর কল্লোলে,/সমুদ্রজোয়ারে প্রাণ সমর্পিত/বজ্রঝড়ে সমর্পিত বুক।' স্বদেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য সবাই মিছিলে গেছে। এখানেও কবি দেখেছেন, মিছিলের সবার মুখে চিত্রিত দেশের চূর্ণ আভা জ্বলছে। 'আমাকে দাও' কবিতায় কবি 'ক্ষুধার অন্ধকার থেকে মুক্ত' হতে চাচ্ছেন। এই অন্ধকার, এই ক্ষুধাও পাকিস্তানি শাসনযন্ত্রের দুরভিসন্ধির কথাই মনে করিয়ে দেয়। 'নাটক : পার্শ্বচরিত্র : নায়ক' শীর্ষক কবিতায় কবি যখন বলেন, 'আমরা নতুন কোনো নায়কের অপেক্ষায় আছি', তখন সেই নায়কের মুখচ্ছবিই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, যিনি স্বদেশকে শত্রুমুক্ত করার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবেন। 'কাব্য-সভায়' কবিতায় কবি যখন বলেন, 'সভায় ধ্বনিত হবে আলোকিত আত্মার কাকলি', তখনও আমরা মুক্তিকামী বাঙালির আন্তরিক অভিব্যক্তিরই অনুরণন শুনতে পাই।

আশায় বসতি কাব্যে আহসান হাবীবের বক্তব্য অনেক বেশি পরোক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত মৃদু। সামরিক শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট মুক্তচিন্তার মানুষ হিসেবে সচেতন-সংবেদনশীল কবিবৃন্দ দেশকে মুক্ত করার প্রত্যয়ে রচিত কবিতায় ভিন্নতর কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। এই সময়ের কবিতায় বক্তব্য উপস্থাপনে রূপকের আধিক্য যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি স্বদেশের মানুষের মুক্তির বাসনাকে রূপকথার আশ্রয়েও তুলে ধরেছেন কেউ কেউ। এই গ্রন্থভুক্ত কবিতায় আহসান হাবীবের বক্তব্য ও প্রকরণে এসেছে নতুনত্বের ছোঁয়া। কিন্তু মানুষের মুক্তির প্রত্যয় থেকে সরে যান নি কবি। মানুষকে ধারণ করেন বলেই মানুষের পরিবেশ-প্রতিপার্শ্বও হাবীবের কবিতায় মুদ্রিত হয়ে যায়।

মেঘ বলে চৈত্রে যাবো (১৯৭৬) কাব্যে আহসান হাবীবের স্মৃতিমগ্নতার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে পল্লি-প্রকৃতির কোলে রেখে আসা শৈশবকে নেড়েচেড়ে দেখার জন্য তিনি বারবার ফিরে গেছেন মাটির টানে। এই টানের মধ্য দিয়েই তাঁর স্বদেশভাবনার নানা পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে। 'বাহাত্তর-পরবর্তী নৈরাজ্যের চাপে ক্ষণিক হতাশা সত্ত্বেও কবিতা বিশ্বাস হারায় না কিংবা বিভ্রান্তিতে পথভ্রষ্ট হয় না। চৈতি খরার দাবদাহ সত্ত্বেও মনে হয়, মেঘের দাক্ষিণ্যে শুকনো মাটির বুক সজল হয়ে উঠবে, মধ্যসত্তরেও পুরনো বোধের নতুন

মোহনায় জাগরণ অনিবার্য মনে হয়।' (আহমদ, ১৯৯৫ : চৌদ্দ)। এই কাব্যের সময় ও সমাজভাবনাকে আমরা তাই কবির স্বদেশভাবনারই অন্যরূপ হিসেবে দেখতে চাই। 'দোহাই তোমার' কবিতায় বৃক্ষনিধনের যে কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে, তাকে স্বার্থান্বেষী মহলের স্বদেশের সৌন্দর্য হননের অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে পাঠ করা যায়। বৃক্ষ যেভাবে ফুলে-ফলে মানুষকে পরিতৃপ্ত করে, তেমনি ছায়া দিয়ে মানুষের ক্লান্তি দূর করতে অবদান রাখে। জন্মভূমিও মানুষকে মায়ের স্নেহে লালন করে। তাই এই দুর্গত বৃক্ষের মধ্যে আমরা স্বদেশের ছবি ফুটে উঠতে দেখি।

আহসান হাবীব 'সার্চ' শীর্ষক কবিতায় মুক্তিযুদ্ধে একজন কিশোরের অদম্য সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। পাকিস্তানের সেনা সদস্যদের চোখের সামনে সদম্ভে হেঁটে চলা এক কিশোরের মনের শক্তিকে এই কবিতায় তুলে ধরেছেন কবি। মানুষের সাধারণ গতায়াতকে বাধাগ্রস্ত করে পথিকের দেহ তল্লাশি করার মাধ্যমে বিব্রত করার বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। 'কুছ নেহি? বোমাওমা? সাচ্ সাচ্ বাতাও, নেহিত...' এই পঙ্‌ক্তিতে পাকিস্তানের বর্বর সেনাদের আচরণ ধরা পড়েছে। কবি যে কিশোরের কথা বলেছেন তার মনে কোনো ভয় নেই : 'নিজেই নিজের হাতে শার্টের প্যান্টের সব পকেট ওল্টায়' সে। তারপর অনুমতি মিললে নিজের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যায় ছেলেটি। পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাংলার আপামর জনসাধারণ নানাভাবে অবদান রেখেছে। নানাবয়সী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণেই অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। কবি এই কবিতায় একজন কিশোরের হৃদয়কেই মহত্তম অস্ত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন :

> বুকের গভীরে
> মহত্তম সেই অস্ত্র যার
> দানবের স্পর্শযোগ্য অবয়ব নেই কোনো
> ধ্বনি যার অহরহ প্রাণে তার বাজায় দুন্দুভি :
> স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা!
> আর সেই প্রিয়তম মহত্তম অস্ত্র বুকে
> লুকিয়ে সন্তর্পণে ধীর পায়ে
> অনন্য কিশোর তার
> সঠিক গন্তব্যে যায় হেঁটে। (*'সার্চ'/মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*)

'স্বাধীনতা' কবিতায় কবি স্বাধীনতার আনন্দকে শব্দের মালায় গাঁথতে চেয়েছেন। স্বাধীনতা কবির কাছে 'আলোকিত অস্তিত্বের আভা'। কবি সবাইকে মুক্তির আনন্দ উপভোগের আহ্বান জানান। এই স্বাধীনতাকে কবি গোলাপ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন, যে গোলাপ কবির অন্তরে প্রস্ফুটিত হয়েছে। 'খোকন ফেরেনি' কবিতায় যে খোকনের কথা বলা হয়েছে, সে আর ফিরে আসবে না তার মায়ের বুকে, কারণ সে জন্মভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। এই একজন খোকনের মাধ্যমে কবি বাংলা মায়ের লক্ষ সন্তানের আত্মদানের কথা স্মরণ করেছেন।

আহসান হাবীবের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থসমূহেও সময়-সমাজ-রাজনীতির নানা ঘটনাপ্রবাহের ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। কিন্তু উপরে আলোচিত গ্রন্থগুলোতে আমরা

যেভাবে সময়ের সঙ্গে কবির নিবিড় সম্পৃক্তির প্রমাণ পাই এবং বিক্ষুব্ধ সময়কে কবিতায় ধারণ করার প্রবল প্রয়াস লক্ষ করি, তা পরবর্তী পর্যায়ে অনেক কমে এসেছে। ধীরে ধীরে কবির আত্মমগ্নতার মাত্রা বেড়েছে এবং কবিতায় জীবনের অন্তর্গত অভিব্যক্তিকে ফুটিয়ে তোলায় অধিকতর মনোযোগ দিয়েছেন কবি। স্বাধীন বাংলাদেশে নানা ঘটনার প্রভাব তাঁর কবিতায় নিশ্চয়ই লক্ষ করা যাবে, কোনো বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতিতে তাঁর প্রতিক্রিয়াও প্রকাশিত হয়েছে নানা কবিতায়। সেই প্রতিক্রিয়ার আগুনে তিনি নিজেই দগ্ধ হয়েছেন, সুদৃঢ় অবস্থানে দাঁড়িয়ে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবাদে জ্বলে ওঠেন নি। বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধেই কবির কলম অধিকতর সাহস ও সক্রিয়তা দেখিয়েছে।

আহসান হাবীব কখনোই সময়-সমাজ-স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হন নি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকে শেষ কাব্য পর্যন্ত তাঁর যে ভ্রমণ, তা সময়ের হাত ধরে সম্পন্ন হয়েছে বলেই কবিতায় অনিবার্যভাবেই সমাজজীবনের নানা ঘটনাপ্রবাহের ছায়াপাত ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে কবি-সমালোচক আহমদ রফিক লিখেছেন :

> চল্লিশের রাত্রিশেষে যে যাত্রার শুরু সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পথের বিভিন্নতা সত্ত্বেও চলমানতার অবসান ঘটে না। এই ঋজু আদর্শ তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে কী চিরায়ত প্রয়োজনে তাঁর কবিতায় এক সহায়ক ভূমিকা পালন করে যায়। তাই গণআন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার আহ্বান ইত্যাদি জনমানসের প্রয়োজনে নদীও ঢেউ তুলে সামনে এসে দাঁড়ায়, বিপর্যস্ত মনুষ্যত্বের সাহায্যে এগিয়ে আসে : দেখি নদী বয়ে যায় দেশময়। শৈল্পিক সততা কোনো শিল্পীকেই দেশজ ঐতিহ্যের সাথে ছিন্নমূল অবস্থায় দেখতে চায় না। চায় না স্বদেশ ও স্বকাল চেতনার সাথে বিচ্ছিন্নতার পথে চলতে। এই বাস্তব সত্যের পরিচয়ই সেই চল্লিশের দশক থেকে আহসান হাবীবের সর্বাধুনিক কবিতাবলীতে পাওয়া যায়। (আহমদ, ১৯৮৭ : ১১৭)

আহসান হাবীবের কবিতায় সময়ের উপস্থিতির ধরন সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য পরিবর্তিত হলেও স্বকালের সঙ্গে কখনোই বিচ্ছিন্ন ছিলেন না তিনি। আহমদ রফিক যথার্থই বলেছেন, 'সমাজচেতনার শিকড় যে তার শিল্পী সত্তার গভীরে প্রথম থেকে অবস্থান নিয়ে ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছিল তার কবিতাই সেই প্রমাণ বহন করে। এমন কি শেষ বয়সের চিন্তাভাবনা ও লেখালেখিতেও দেশ কাল ও সমাজচেতনার প্রতিভাস স্পষ্ট।' (আহমদ, ১৯৯৫ : ষোলো)। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের কদর্য রূপটিকে তিনি যেমন কবিতায় তুলে ধরেছেন, তেমনি সমাজ-পরিবর্তনে শোষিত-নিপীড়িত মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে– এ কথাও দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন।

রাজনৈতিক অস্থিরতা যখন সমাজের সুস্থ-স্বাভাবিক প্রবাহকে প্রতিহত করে, তখন রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতাও আহসান হাবীবের কবিতার বিষয় হয়ে ওঠে। কবিতায় তিনি মানুষকেই নানা অবয়বে নির্মাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন বলে মানুষের জীবনে সমাজ-রাজনীতির প্রভাবকে তিনি এড়িয়ে যেতে চান নি। যে কালের আবর্তে গড়ে উঠেছে তাঁর মানসভূগোল, তাঁর প্রভাব এড়িয়ে কোনো মহৎ সৃষ্টি সম্ভব নয় — এই উপলব্ধিই তাঁকে আমৃত্যু সময়-সমাজ-রাজনীতি সম্পৃক্ত রেখেছে। তাই সময় ও সমাজকে আঁকড়ে ধরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আহসান হাবীবের কবিতার পৃথিবী।

সহায়কপঞ্জি

আনওয়ার আহমদ (১৯৮৭), 'হাবীব ভাই প্রতিশোধ নিলেন', *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ* (সম্পাদক : রোকনুজ্জামান খান), আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি, ঢাকা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৮৮), 'কবিতা', *বাংলাদেশের সাহিত্য* (সঙ্কলন উপবিভাগ কর্তৃক সঙ্কলিত) বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আহসান হাবীব (১৯৯৫), *আহসান হাবীব রচনাবলী* ১ (সম্পাদক : আহমদ রফিক), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আহমদ রফিক [সম্পাদক] (১৯৯৫), *আহসান হাবীব রচনাবলী* ১, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আহমদ রফিক (১৯৮৭), 'আহসান হাবীবের কবিতা : কয়েকটি সূত্র', *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ* (সম্পাদক : রোকনুজ্জামান খান), আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি, ঢাকা।

জীবনানন্দ দাশ (২০০২), *কবিতার কথা*, প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

তারেক রেজা (২০০৯), *কবিতা : কালের কণ্ঠস্বর*, গ্লোব লাইব্রেরি প্রা. লি., ঢাকা।

তুষার দাশ (১৯৮৫), *আহসান হাবীবের কবিতা : নিঃশব্দ বজ্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

(১৯৮৮), *আহসান হাবীব*, জীবনী গ্রন্থমালা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

দিলারা হাফিজ (২০০২), *বাংলাদেশের কবিতায় ব্যক্তি ও সমাজ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

ফজলুল হক সৈকত (২০০২), *তিরিশোত্তর কাব্যধারা ও আহসান হাবীবের কবিতা*, কল্লোল বুক সেন্টার, ঢাকা।

বিনতা রায়চৌধুরী (১৯৯৭), *পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য*, সাহিত্যলোক, কলকাতা।

বিশ্বজিৎ চৌধুরী (১৩৯৮), 'আহসান হাবীবের কবিতা : পরিণতির পরম্পরা', *বাংলা একাডেমি পত্রিকা* (সম্পাদক : মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

বুদ্ধদেব বসু (১৯৫৯), *রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য*, নিউ এজ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা।

বেগম আকতার কামাল (২০১৩), *কবির চেতনা : চেতনার কথকতা*, ধ্রুবপদ, ঢাকা।

মধুসূদন চক্রবর্তী (১৯৮২), *বাংলাদেশের (পূর্ববঙ্গের) আধুনিক কবিতার ধারা (১৯৪১-১৯৭১)*, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা।

মাসুদুজ্জামান (১৯৯৩), *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মাহবুব সাদিক (১৯৯১), *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯৯৫), *মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচনাবলী* [সম্পাদক : সৈয়দ আবুল মকসুদ], প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯৬৭), *সাহিত্যের নবরূপায়ণ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান (১৯৮৯), *কবিতা ও সমাজ*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

(২০০২), *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম [সম্পাদক] (১৯৭১), *আধুনিক কবিতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৬), *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, ঐতিহ্য, ঢাকা।

সমর সেন (১৩৮৮), *সমর সেনের কবিতা*, পঞ্চম পরিবর্ধিত সংস্করণ, সিগনেট প্রেস, কলকাতা।

সাঈদ-উর রহমান (২০০১), *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৯৮৭), 'আহসান হাবীবের গৃহানুসন্ধান', *আহসান হাবীব স্মারক-গ্রন্থ* (সম্পাদক : রোকনুজ্জামান খান), আহসান হাবীব স্মৃতি কমিটি, ঢাকা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (২০০৩), *কবিতাসংগ্রহ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়* (সম্পাদক : সুবীর রায়চৌধুরী), তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

স্বপন সেনগুপ্ত (২০০৪), *পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা কবিতা*, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, কলকাতা।

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৯৪), *হাসান হাফিজুর রহমান রচনাবলী* (সম্পাদক : রফিকউল্লাহ খান), প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৯৬), *শামসুর রাহমান : নিঃসঙ্গ শেরপা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

হোসেনউদ্দীন হোসেন (১৯৯৪), *ঐতিহ্য আধুনিকতা ও আহসান হাবীব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

C.D. Lewis (1947), *A Hope For Poetry*, 18th Ed.Oxford. Basil-Blackwell.